Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 195-207
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.064

দলিত কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের কবিতায় প্রেম, প্রতিরোধ ও পুরাণ প্রসঙ্গ: নারীচেতনাবাদের এক স্বতন্ত্র স্বর

মহেন্দ্র নাথ পাল, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.01.2026; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In recent times, 'Feminism' has become a widely discussed topic in the world of literature and culture. However, the nature and expression of this feminism are not uniform everywhere. The expression and strategies of feminism have changed and diversified across different countries and historical periods. Furthermore, in today's globalized world, 'Dalit Feminism' has emerged as a significant part of this feminist discourse. Kalyani Thakur Charal (1965-), a Dalit feminist poet, is one such writer whose work stands as a testament to her tireless efforts in constructing a resistant voice against patriarchal and upper-caste society, and against political oppression and exploitation, by incorporating both 'feminism' and 'Dalit consciousness'. However, her poetry does not merely construct a conventional form of feminism by simply opposing patriarchy in a typical manner. Therefore, it is quite difficult to categorize her as a feminist poet in the conventional sense or to place her in the line of traditional feminist poets. Doing so would lead to a deviation from artistic truth in literary criticism. Rather, in her poetry, women emerge as a 'Dalit Community' or 'Dalit Class' within society, raising their voices against the prevailing social structure. Or, not just from the perspective of an ordinary woman, but from the fundamental viewpoint of a Dalit woman, the audacity to repeatedly point a finger at the entrenched structure of patriarchal and upper-caste society has become the subject matter of her poetry. There, she has launched her warship against the current of resistance, using love and mythology as her weapons. This discussion highlights this distinct and pan-Indian voice of feminism through the newly constructed narratives of love and mythology in the poetry of the Dalit poet Kalyani Thakur Charal.

Keywords: Chandal, Dalit, Patriarchy, Exploitation, Love, Equality, Freedom, Mythology

বাংলা দলিত সাহিত্যের একজন অন্যতম নারীবাদী কবি হলেন কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল (১৯৬৫-)। ভারতীয় দলিত নারীবাদী কবি তথা সাহিত্যিক হিসেবে তিনি পরিচিত হয়ে আসছেন পাঠকের দরবারে। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বগুলাতে তিনি এক মতুয়া পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এই 'চাঁড়াল' পদবীটি ব্যবহারের পিছনেও রয়েছে এক সুতীব্র প্রতিবাদ। কারণ দলিত পরিবারে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য একাধিক সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হয় তাঁকে। তিনি অনেক কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন সামাজিক বিধিনিষেধ ও প্রতিবন্ধকতার দেওয়ালগুলো। 'চণ্ডাল' শব্দটির অপভ্রংশের রূপ হল 'চাঁড়াল'। চণ্ডালকে সামাজিক মাপকাঠিতে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। তারই প্রতিবাদ স্বরূপ কবি এই 'চাঁড়াল' পদবীটি ব্যবহার করেন। কবি কল্যাণী ঠাকুর দীর্ঘদিন ধরে 'নীড়' নামক একটি দলিত সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদনা করে আসছেন। যেখানে সুদীর্ঘকাল

যাবৎ বাংলা ভাষায় একাধিক দলিত কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত' (২০০৩)। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'যে মেয়ে আঁধার গোণে' (২০০৮), 'চণ্ডালিনীর কবিতা' (২০১১), 'চণ্ডালিনী ভণে' (২০১৫)। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয় কবির পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'বনচণ্ডালীর গাথা' (২০২৩)। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি হল 'আমি কেন চাঁড়াল লিখি' (২০১৬)। বিখ্যাত দলিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর আত্মজীবনী 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন'– এর মতোই আদৃত গ্রন্থটি। ২০১২ সালে কল্যাণী ঠাকুরের 'চন্ডালিনীর বিবৃতি ১' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তবে 'চণ্ডালিনীর বিবৃতি ২' আলাদা করে প্রকাশিত না হলেও ২০২১ সালে প্রকাশিত 'কল্যাণী রচনা সমগ্র' (প্রথম খণ্ড)-এ এই প্রবন্ধ সংকলনটি স্থান পায়। কবি রূপেই তিনি মূলত প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর ছোটগল্পের সংকলন গ্রন্থটিও পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত। তাঁর ছোটগল্প ও অণুগল্পের সংকলন গ্রন্থটির নাম 'ফিরে এল উলঙ্গ হয়ে' (২০১৪)। আর কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের লেখা একমাত্র উপন্যাসটি হল 'আন্ধার বিল ও কিছু মানুষ' (২০১৯)। তবে কবি রূপেই কল্যাণী ঠাকুর অধিক সুপরিচিতি লাভ করেছেন পাঠকের কাছে।

কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের বিভিন্ন কবিতাতেই প্রকাশ পেয়েছে প্রচলিত পুরুষতন্ত্রের বিপ্রতীপে গড়ে ওঠা একটি প্রতিরোধী কণ্ঠস্বর, নারী-পুরুষের সাম্যচিন্তা, নারীর বেদনা, বিষণ্ণতা ও প্রতিবাদী উচ্চারণ। তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা নারীত্বের আখ্যান নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কথনবিন্দুর একটি ভিন্ন 'ন্যারেটিভ' প্রস্তুত করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিককালে নারীবাদের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে যে 'দলিত নারীবাদ' (Dalit Feminism) বহুচর্চিত হয়ে উঠছে; সেই সাহিত্যধারার অন্যতম কবি তিনি। এই দলিত নারীবাদে বলা হয়েছে, পৃথিবী যত উন্নত হয়েছে, সভ্য হয়েছে, তত বেশি আদিবাসী-দলিত নারীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে। তাই দলিত নারীদের যন্ত্রণার প্রবণতা বহুমাত্রিক। কারণ তারা নিজের পরিবারের দলিত পুরুষদের দ্বারা নির্যাতিত হয়। আবার শাসক পুরুষের রক্তচক্ষু ও যৌন নিপীড়ণ নেমে আসে তাদের ওপর। এইভাবে 'দলিত নারীবাদে'র মূল ভাবসত্যটিই যেন শিখা হয়ে তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জ্বলে উঠতে চেয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়- প্রেম, প্রতিরোধ, নারী-পুরুষের সাম্যচিন্তা, পৌরাণিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও নবনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যে নারীচেতনাবাদের এক বহুমুখী স্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর নির্বাচিত কয়েকটি কবিতার ভিত্তিতে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হবে।

প্রথমেই আসা যাক কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চণ্ডালিনীর কবিতা'(২০১১)-র কবিতাগুলিতে। এই কাব্যটির কবিতাগুলির কোনো নাম নেই। শুধু ক্রম অনুসারে সংখ্যা দিয়ে সাজানো আছে কবিতাগুলি। 'কল্যাণী রচনা সমগ্র' (প্রথম খণ্ড)-এর সংস্করণে এই কাব্যটিতে মোট ৫২ টি কবিতা আছে। তবে কাব্যটি প্রথম প্রকাশের সময় এর কবিতার সংখ্যা ছিল ৫৩ টি। পরে একটি কবিতা বাদ দেওয়া হয় এই 'রচনা সমগ্রে'র সংস্করণে। এই কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় উঠে এসেছে সমাজের সাম্যচেতনা, খেটে খাওয়া মানুষের কান্না, দেশত্যাগ ও নির্বাসনের বেদনা, নারী হৃদয়ের যন্ত্রণা, জীবনে বেঁচে থাকার দৈনন্দিন লড়াই, বর্ণবৈষম্যবাদ, রাজনৈতিক জগতের ধূর্ততা সবকিছুই। তাই শিল্পী হিসাবে তাঁর নারীবাদ; সর্বাঙ্গীণ মানবতাবাদ বা সামগ্রিক মানুষের কথাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। তাই তিনি অসহায়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন, শক্তিহীনের কথা তুলে এনেছেন তাঁর কলমে। আর সত্যি কথা বলতে কি, শাসক আর শোষক যার পায়ের তলার মাটিটা যেই মুহূর্তে কেড়ে নিয়েছে; তখনই তো সেই মানুষটা পরিণত হয়ে যায় 'দলিত'-এ। সেটা নারী-পুরুষ নির্বিশেষেই। এইভাবেই কল্যাণী ঠাকুরের কাব্যবৃত্তে দেশকাল নিরপেক্ষ সাম্যচেতনা কখনো কখনো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'চণ্ডালিনীর কবিতা'র ১১ সংখ্যক ('আমি তো মুক্তিকামী') কবিতাটি। কবি পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর এই কবিতাটিতে সেই দেশ-কাল, রাজনীতি চেতনা, মুক্তিযুদ্ধ সবই এসে পড়েছে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে। তিনি

রাজনৈতিক হিংসা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাই কবি এই কবিতায় নিজেকে 'মুক্তিকামী' বলেছেন। সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তিনি মুক্তি প্রার্থনা করেছেন। এই স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয় । এখানে নারী-পুরুষের সাম্যের স্বাধীনতার কথা ধ্বনিত হয়েছে। একটা উচ্চ শ্রেণির মানুষের পাশাপাশি একটা নিম্ন শ্রেণির, নিম্ন বর্ণের বা নিম্ন বৃত্তির মানুষেরও সমান স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছেন তিনি। এই কাব্যের ১১ সংখ্যক কবিতায় কবির সেই সাম্যচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে–

"আমি তো মুক্তিকামী
তাই একা ভাসায়েছি নাও
দেশান্তরে যাব বলে
বয়ে চলি দূর নদী সাগরের পার"[১]

এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় (১ সংখ্যক কবিতা) উঠে এসেছে দলিত ও শ্রমিক সমাজের অসহায়তার কথা। কিভাবে একজন দলিত দরদী বড় হয়ে ওঠে শ্রমিকের স্বার্থকে পুঁজি করেই; কিভাবে শ্রমিকের অধিকারের দাবিকে হাতিয়ার করেই সাফল্য আসে একজন শ্রমিক নেতার বিমর্ষ জীবনে- সে কথাই কবি বলতে চেয়েছেন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে। মধ্যবিত্ত মানুষের কিছু আপোসময় মানসিকতা, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার ইঙ্গিত ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখী'র মতো মধ্যবিত্ত মানুষেরও বালিতে মাথা গুঁজে থাকার দ্বিচারিতাকে কবি তুলে ধরেন 'চণ্ডালিনীর কবিতা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায়। তাই তিনি লেখেন–

"শ্রমিক-দলিত কাররই স্থানবদল হয় না
সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে তরতর উঠে যায়
নেতা হাত ধরে মালিক
অথবা দলিত বিদ্বেষীর"[২]

-আসলে এই অভিজ্ঞতা কবির বাস্তবজীবন প্রসূত। দলিত সমাজে থেকে সেই যন্ত্রণা তিনি উপলব্ধি করেছেন আত্ম অক্ষরে, নিভৃত অস্মিতায়। একইভাবে 'চণ্ডালিনীর কবিতা' কাব্যগ্রন্থের শেষতম কবিতাতেও (৫২ সংখ্যক) দেখি দলিত মানুষের প্রতি, সমাজে পিছিয়ে পড়া ও বর্ণবৈষম্যবাদের শিকার হওয়া মানুষের প্রতি কবির নিবিড় আহ্বান । যে আহ্বানে আছে মানুষকে জাগিয়ে দেওয়ার মতো তেজ, দীপ্তি ও প্রতিরোধ–

"ভোরের পাখি ডাক দিয়ে যাই
কালো মানুষ জাগো
হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকা
মানুষের দল জাগো"[৩]

-কবির দৃষ্টিতে কালো মানুষ বলতে তারাই যারা সমাজের মূল আলো থেকে বঞ্চিত; অন্ধকারের বাসিন্দা যারা। বিশেষত নারীসমাজও এই অন্ধকার বৃত্তের অধিকারী। তাই সব মিলিয়ে এই কবিতায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কবি সকলকে জেগে উঠতে বলেছেন নিজস্ব অধিকারের দাবিতে।

কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'যে মেয়ে আঁধার গোণে' (২০০৮)। এই কাব্যগ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা ৫১ টি। এই কাব্যগ্রন্থেরই একটি অন্যতম কবিতা হল 'তোমার দিকে'। এই কবিতাটিতে ধরা পড়েছে তাঁর প্রেমিকা হৃদয়ের বিষণ্ণতার ছবি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রেমবঞ্চিত ও বিধ্বস্ত অবস্থাটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কবি তাঁর এই কবিতায়। কবি দেখিয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য নারীকে কিভাবে বোমাবিধ্বস্ত পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যায়। তবুও নারী ভালোবেসে সেই প্রেমিক পুরুষেরই প্রত্যাশা করে।

এইভাবে প্রেম ও ভালোবাসায় পুরুষবাদী প্রতাপ এবং তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা নারীর বিষণ্ণতা ও প্রতিরোধী কণ্ঠস্বরকে কবি কল্যাণী ফুটিয়ে তোলেন এই ভাষায় –

"আত্মঘাতী বোমায় নির্মিত
ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
প্রিয় মানুষ তোমারই দিকে"[৪]

- এই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে কবি হৃদয়ের বিষন্নতা ও তাঁর হৃদয়ের বিপন্ন অস্তিত্বের ছবি। যে বিষন্নতার জন্য দায়ী প্রেমের পুরুষতান্ত্রিক দাপট। প্রেমের বিষণ্ণতার কারণ হিসেবে তাকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন কবি।

'যে মেয়ে আঁধার গোণে' কাব্যগ্রন্থের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা হল 'অণুকবিতা'। এখানে কবি বলেছেন মানুষ তার আপাত ভদ্রতার খাতিরে কেউ কাউকে আঘাত করতে চায় না। কিন্তু সকলের অগোচরে আমরা সকলেই বিক্ষত হই। আমাদের শরীরও বিক্ষত হয়। পুরুষ নারীযোনিকে বিক্ষত করার মধ্য দিয়ে এই আত্মসুখ অনুভব করে, আত্মতৃপ্তি খুঁজে নেয়। এইভাবে পুরুষতান্ত্রিক আঘাতকে কবি চিহ্নিত করেন এই কবিতায়। আমরা সাধারণত প্রকাশ্যে নিজের বেদনাকে বুঝতে দিই না। কিন্তু আমাদের নীরব যন্ত্রণার সাক্ষী থাকে অশ্রুসিক্ত বালিশ। কবি নারীর দুঃখকে বুঝিয়ে দেন এক বিশাল কাব্যিক উপমার সাহায্যে। কবি বলেন তিনি দুঃখদীঘি খনন করে বারবার তাতে অবগাহন করে ফেলেন। এইভাবে কবিতাটির মধ্যে কবির মনস্তাত্ত্বিক বিষণ্ণতা রূপ পায়–

"কারও কাছে ভেঙে তো পড়িনি কোনদিন
ভিজে বালিশ কিন্তু সব জানে"[৫]

- কিন্তু এই বিষণ্ণ হৃদয়ের গ্লানিবোধের সমাধান হয় না কিছুতেই। দেখা হলেও কথা হয় না অপর পক্ষের মানুষটির সাথে। তাই সেই বিষণ্ণতার রেশ থেকেই যায়।

কল্যাণী ঠাকুরের 'যে মেয়ে আঁধার গোণে' কাব্যগ্রন্থের আরেকটি কবিতা হল 'জীবনের কথা বলি'। কবি এখানে জীবনের কথা বলতে চান, জানাতে চান গোপন ভাষায়। যে ভাষা বুঝে নেবে নিশ্চুপ চাঁদ। আকাশ ভেদ করে সে ভাষা পৌঁছে যাবে দূর-দূরান্তরে, জীবনের অলি-গলিতে। যে ভাষায় মানুষ তার জীবনের স্বাধিকার খুঁজে পাবে। নারী তার জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাবে। এইভাবে নারীর প্রতিরোধী কণ্ঠস্বর কবিতাটিতে উপস্থিত হল-

"এসো জীবনের কথা বলি
আমাদের গোপন ভাষাটি
গহন আঙিনা বেয়ে চলে
যাক তিমির গগন পারে"[৬]

- যেখানে হাজারো অন্ধকার ভেদ করে জয়ী হয় জীবনের গান, বেঁচে থাকার প্রত্যয়। সেই ইতিবাচক বিশ্বাসে ভর করেই কবি গড়ে তোলেন তাঁর জীবনবোধ।

কবির এরকম স্বাদের আরেকটি কবিতা হল 'এসো সন্ধির কথা বলি', যা এই কাব্যগ্রন্থেরই অন্তর্গত। যেখানে যুদ্ধের থেকে শান্তি, পরাজয়ের থেকে জীবন বড় হয়ে ওঠে। তাই নবপুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত হৃদয় নিয়ে তিনি প্রেমিকের কাছে জীবনের গান গেয়েছেন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে-

"প্রিয় প্রেমিক এসো জীবনের
কথা বলি

শুধু সন্ততির কথা ভেবে
এসো সন্ধির কথা বলি"[৭]

- নারীর প্রেমের এই উচ্চারণ পুরুষের কাছে হেরে যাওয়া নয়। এ এক তীব্র জীবনপ্রীতি। এই সমঝোতা আসলে জীবনেরই জন্য।

'যে মেয়ে আঁধার গোণে' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'তত ভালো নই'। সেখানে কবির পুরাণ প্রসঙ্গের পুনরুদ্ধারের চিত্র দেখি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে অপদস্থতার চোখে দেখা হয়েছে চিরকাল। খারাপ মানেই সর্বদা নারী, পুরুষ কখনো খারাপ হতে পারে না। এমন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিবাদ ক'রে কবি কবিতাটি লিখছেন। কবিতাটির নামকরণটিও তার প্রমাণ দেয়। তাই পুরাণ প্রসঙ্গের আধারে তিনি তীব্র নারীবাদী স্বরকে প্রতিষ্ঠা করছেন এই কবিতায়। নারীর গায়ে 'সতী'র তকমা লাগিয়ে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আসলে তার স্বাধীনতা রোধ করতে চায়। শ্বাসরোধ করতে চায় তার অধিকারগুচ্ছের। এ কথাই যেন কবি বলতে চান। তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ বলেন -

"একালের সীতা হয়ে
ততটা কি সতী হতে পারি"[৮]

- এই কাব্যগ্রন্থেরই শেষ কবিতা 'ভিতর পানে'তে নারী হৃদয়ের গহন প্রদেশে লুকিয়ে থাকা প্রেমের গভীরতাকে চিহ্নিত করেছেন কবি। যে প্রেম আপাতভাবে আবৃত হলেও তা খাঁটি সোনার মতোই স্বচ্ছ। কবির হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা অব্যক্ত চোখের জল, গোপন নীরব কান্নাই চিনিয়ে দিয়েছে তাঁর প্রেমিকা সত্তার বিশুদ্ধতাটুকু। কিন্তু তার সত্ত্বেও পুরুষের চোখে নারীর সেই গভীরতর প্রেম ধরা পড়ে না সহজে। তা থাকে উপেক্ষিত। তাই কবি নারীর ভিতর পানে চাওয়ার আকুতি জানিয়েছেন পুরুষকে, পুরুষ প্রেমিককে–

"জানতেই না অজুত বৃষ্টিধারা
লুকিয়ে আছে ভিতর পানে।"[৯]

- এইভাবে 'যে মেয়ে আঁধার গোণে' কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায় নারী হৃদয়ের প্রেম, বঞ্চনা, বেদনা, যন্ত্রনা ও সমাজে নারীর কোণঠাসা অবস্থান এবং তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিরোধী স্বরটুকু ফুটে উঠেছে।

কবি কল্যাণী ঠাকুরের কাব্য জীবনের হাতেখড়ি 'ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত' (২০০৩) কাব্যগ্রন্থ দিয়ে। এই কাব্যগ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা ৪৯ টি। কাব্যটিতে মোট তিনটি পর্ব আছে। প্রথম পর্ব 'প্রতিটি রাত্রি জানে', দ্বিতীয় পর্ব 'অশ্ব সিরিজ' আর তৃতীয় পর্ব 'পাছে বর্ণান্ধ হয়ে যাই'। এর মধ্যে থেকে এই কাব্যেরই দ্বিতীয় অংশ 'অশ্ব সিরিজ' ৮টি কবিতা নিয়ে আলাদা করে প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। 'ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত' কাব্যগ্রন্থের 'অশ্ব সিরিজে'র একটি বিখ্যাত কবিতা হল 'অশ্বমেধের ঘোড়া'। এটি 'অশ্ব সিরিজ'-এর দ্বিতীয় কবিতা। যেখানে কবি পুরাণ প্রসঙ্গের পুনর্নির্মাণ ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে একটি নারীর বা একটি প্রেমিকার আধুনিক জীবনবোধকে মিশিয়ে দেন। এটি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা একটি বিখ্যাত কবিতাও বটে। এখানে তিনি পুরাণ অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে নারীর চিরকালীন পরাজিত অবস্থানটিকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আমরা জানি যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের নিয়ম অনুসারে ঘোড়াটিকে যজ্ঞ-অর্চনা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর সেই ঘোড়াটি যতদূর পর্যন্ত এলাকা অতিক্রম করবে, সেই সবটুকু অঞ্চল ওই ঘোড়ার অধিকারী রাজার অধীন হয়ে উঠবে। আর যে ব্যক্তি এই ঘোড়া আটকাবে তার সাথে যুদ্ধ সুনিশ্চিত। এই কবিতাটিতে কবি সেই পুরাণ প্রসঙ্গ বা পৌরাণিক ভাবনার বিনির্মাণ ঘটালেন।

কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' কবিতায় প্রথমেই দেখি একটি চিত্রকল্পের উপস্থিতি। এখানে দেখি জোব চার্ণকের সমাধির ওপর থেকে ফুল তুলে দেওয়া হচ্ছে। এটি বন্ধুত্বের স্মারক। এর মধ্য

দিয়ে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে, বন্ধুত্ব হয়তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে । প্রেম তখন একা ভাসছে । কবি লিখেছেন–

"প্রেম তখন ভাসছে ভেলায়"[১০]

- আসলে সমাধির মধ্যে আছে চিরকালীন ঘুম এবং অনাবিল প্রশান্তি। সেখান থেকে ফুল তুলে দিলে সেই বন্ধুত্ব আর এগোবে না। তাই সেই প্রেম এখন ভাসছে ভেলায়। দ্রৌপদীকে যেমন পুরাণ থেকে তুলে এনে তামিলনাড়ুর প্রখ্যাত দলিত নারীবাদী কবি মীনা কান্দাসামি ভারতীয় নারীর অত্যাচারিত রূপকে পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন তাঁর 'Ms. Militancy' কাব্যগ্রন্থের 'Six Hours of Chastity' কবিতায়, তেমনই কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল এখানে বেহুলাকে পুরাণ-কথিত আখ্যান থেকে তুলে এনে সমকাল বিন্দুতে প্রতিস্থাপিত করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দেব-মানবের দ্বন্দ্বে একটি নারীকে কিভাবে বঞ্চিত হতে হচ্ছে, তা আমরা বেহুলার মধ্য দিয়ে দেখি। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' কবিতাটি সেরকমই বেহুলার মতো অজস্র বঞ্চিত নারীর বয়ানে লেখা। এই বেহুলার আদতে কোনো দোষ ছিল না। এটা দেব-মানবের ক্ষমতার রাজনীতি। এটি একটি ঐশ্বরিক দ্বন্দ্ব। আর জোব চার্ণক কলকাতাকে তথা একটি মহানগরকে সৃষ্টি করেছেন। যাঁর সমাধি হয়ে গেছে, তাঁর সমাধি ইতিহাসের বা দীর্ঘ অতীতের চিহ্ন হয়ে আছে। এখানে কবি ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। কারণ নারীকে তার প্রেম-বন্ধুত্বের স্বাধীনতা পেতে বারবারই বাধাপ্রাপ্ত হতে হচ্ছে। ইতিহাস তার সাক্ষী আছে। তাই ইতিহাসকে সাক্ষী রেখেই এই সম্পর্ক। জোব চার্ণকের সমাধি যা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে, যা থেকে কোনো নতুনের সম্ভাবনা নেই, সেই সমাধি থেকে ফুল তোলার অর্থই হল নর-নারীর সম্পর্কের ছেদ-ব্যঞ্জনা। কবি বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এভাবে–

"জোব চার্ণকের সমাধি থেকে
কুড়ানো ফুল দিয়ে বলেছিলাম
এ আমাদের বন্ধুত্বের স্মারক"[১১]

আসলে মনসা মানবসমাজে পূজা লাভ করবে কিনা এই নিয়েই মূল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে দেবতা ও মানুষের। তাই স্বাভাবিকভাবেই মনসা চাঁদ সদাগরের মতো ক্ষমতাসীন মানুষকে অবলম্বন করবে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে। মনসা লখীন্দরকে হত্যার মাধ্যমে সে তার লড়াইয়ে জয়ী হবে। মনসাকে এখানে দাঁড় করানো হচ্ছে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে। এখানে কিন্তু লখীন্দরকে মারা হচ্ছে বিবাহের পরেই, বিবাহের পূর্বে নয়। যে মেয়ে বিয়ের রাতে স্বামীকে হারাচ্ছে, তাকে বলা হবে সামাজিক পরিচয়ে 'কুলটা'। তাতে তাকে 'অসতী' বানানো সহজ হবে। তাই লখীন্দরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চাঁদ সদাগরের যন্ত্রণা নয়, তার চেয়ে বেশি আলোকিত হবে বেহুলার নারীত্বের অপমান। এটাই তো দেখানো সমাজের মূল উদ্দেশ্য। মনসা যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্যই মনসার এই রাজনীতি। তাই বেহুলা-আখ্যানে মনসা সম্পূর্ণরূপে পুরুষতন্ত্রের উপস্থাপক। এক নারী হ'য়ে বেহুলা যেখানে যন্ত্রণাদগ্ধ হচ্ছে; সেখানে অপর নারী হিসেবে মনসাই কিন্তু পুরুষতন্ত্রের বাহক হয়ে উঠছে। অথচ একটা নারীর পুরুষের প্রতি, প্রেমিকের প্রতি তার পতিব্রতা ও ত্যাগের নিষ্ঠাকে অভিনন্দিত করা হচ্ছে। আমাদের সমাজব্যবস্থায় দেখানো হয়েছে, একটি নারীর পুরুষের প্রতি যে উৎসর্গ তাতেই সে ঐশ্বরিক ও আদর্শায়িত হয়ে যাবে। আমাদের সমাজ মেয়েদের উপর সমস্ত কিছু জোর করে চাপিয়ে দিতে থাকে। তাই বেহুলার ওপরেও নারীত্বের সংস্কার চাপিয়ে দিয়ে তাকে 'পবিত্র' করে তুলেছে এই সমাজ। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় সুমন চট্টোপাধ্যায় (কবীর সুমন)-এর এই বিখ্যাত গানের পংক্তিটি– "বেহুলা কখনো বিধবা হয় না, এটা বাংলার রীতি।"- এই ভাবেই বেহুলাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সবকিছু। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, একালের বাংলা কবিতার আর এক বিখ্যাত কবি সব্যসাচী দেব তাঁর 'বেহুলা ভাসান' কবিতায় বেহুলার সমগ্র

যাত্রাটি অঙ্কিত করেছেন। এই সব্যসাচী দেব বেহুলা-দ্রৌপদী-সীতা এই তিন নারীকে নিয়েই কবিতা লিখেছেন। প্রসঙ্গক্রমে কল্যাণী ঠাকুরের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' কবিতাটির সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। কারণ সব্যসাচী দেবের এই কবিতার মতো কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালও পুরাণকে নব-অনুষঙ্গে নির্মিত করেছেন বা তুলে এনেছেন।

কল্যাণী ঠাকুরের কবিতায় এই ঘোড়াটি হল আসলের লড়াইয়ের প্রতীক। যে ব্যক্তি ঘোড়াটি ধরে ফেলবে তার সঙ্গে যুদ্ধ সুনিশ্চিত। সেখানে বাইরের যুদ্ধটা মনসা ও চাঁদ সদাগরের সঙ্গে। কিন্তু এক্ষেত্রে ঘোড়াটি আদতে ধরে ফেলছে বেহুলা। আসল যুদ্ধটা তাই বেহুলার সঙ্গে সকলের। এখানে বেহুলা যুদ্ধ করছে চাঁদ সদাগর, মনসা-সহ সকল দেবতাদের বিরুদ্ধে, সমস্ত পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। বেহুলার ব্যথায় সমব্যথী কেউ নয়। এ দুঃখ, এ যন্ত্রণা তার একার; একান্তই নিজের। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, কবি জীবনানন্দ দাশও তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় বেহুলার প্রসঙ্গ এনেছিলেন। জীবনানন্দের মতো একালের কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালও তাঁর কবিতায় বেহুলা-কথাকে নতুন করে স্থান দিয়েছেন। বিয়ের রাতে লখাই-হত্যার মাধ্যমে বেহুলাকে অপদস্থ করা হল এই কারণেই; যাতে একটি নারীর অবস্থানই বেশি সংকুচিত হয়ে ওঠে। বেহুলার অবস্থা বা পরিণতি কি হবে, তা আদতে সকলেই জানতেন- বিশ্বকর্মা, অন্যান্য দেবদেবী, মনসা সকলেই। তাকে শেষ অবধি পতিনিষ্ঠার কারণে নাচতে হচ্ছে ভরা সভায় পুরুষ দেবতাদের সামনে। আগে এভাবে নাচত মূলত বারাঙ্গনারাই। সেখানে একটি সাধারণ নারীকে গিয়ে নাচতে হচ্ছে তার পতি-দায়ের কারণে। লখীন্দর মারা না গেলে বেহুলাকে তার আত্মসম্মান বলি দিয়ে কাঁচুলি খসাতে হত না। মনসা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পূর্ণতই যুক্ত। বেহুলার সামাজিক অবস্থানকে অস্বীকার করে তাকে পুরুষের বিনোদন ও বিলাসের বস্তু হয়ে উঠতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত। তাই একটি নারী যখন তার ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিতে চাইছে সে আসলে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। আসলে নারীকে বেঁচে থাকতে হলে যুদ্ধে লিপ্ত হতেই হবে। কবি তাই বলছেন–

> "হায় রে! বেহুলা সখী বাসরেই
> জেনে গেছি– এ যে অশ্বমেধের
> ঘোড়া, ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত"[১২]

- প্রকৃতপক্ষে তাকে বাঁচতে গেলে সে যুদ্ধ করতে বাধ্য। আমাদের সমাজব্যবস্থায় এই নারী এতটাই অসহায়। তাই এই কবিতার মধ্য দিয়ে কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল বোঝাতে চাইলেন- বেহুলাদেরই যুদ্ধ করতে হয়েছে প্রতিনিয়ত। সে-ই আসলে ধরে ফেলেছে অশ্বমেধের ঘোড়াটি। নারীকে এভাবেই যুদ্ধ করতে হয়েছে, যুদ্ধ করতে হয়। এভাবেই নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল তাঁর 'অশ্বমেধের ঘোড়া' কবিতাটিকে উপস্থাপিত করলেন।

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করা যায়, কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের কবিতার মতো একাধিক ভারতীয় সাহিত্যেই এই অশ্বমেধের ঘোড়ার পৌরাণিক প্রসঙ্গ নানাভাবে এসেছে। পুরাণকে তাঁরাও নবনির্মিত করেছেন এইভাবেই। যেমন পঞ্চাশের দশকের বাংলা কথাকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে, কবি মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্র-কবিতায়, আধুনিক বাংলা কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কবিতার বদলে কবিতা' কাব্যগ্রন্থের 'ঘোড়া' কবিতায়। অশ্বমেধের ঘোড়ার পুরাণ-প্রসঙ্গকে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে এক আধুনিক জীবনভাষ্য নির্মাণের চেষ্টা করেছেন কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালও। সেই পথের পথিক হ'য়ে পুরাণ ভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি নারীর প্রেম ও প্রতিরোধের বয়ান নির্মাণ করেছেন। নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে যেমন বেহুলা চরিত্রকে অভিনব কাঠামোয় পুনর্নির্মিত করেছিলেন; ঠিক একইভাবে কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালও এই কবিতায় বেহুলা ভাবনার বিনির্মাণ ঘটালেন। আসলে পুরাণ-কথিত বেহুলা আখ্যান ও অশ্বমেধের ঘোড়া ভাবনার বিনির্মাণ ঘটিয়ে কবি এখানে নারীর সংকুচিত অবস্থানটি

দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষ্য নির্মাণ করলেন। ভালোবাসার জন্য বেহুলাকে খোয়াতে হচ্ছে আত্মমর্যাদা। যেন তাকে লিপ্ত হতে হচ্ছে একটা যুদ্ধে। যেরকম অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত।

'ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত' কাব্যগ্রন্থের 'বেয়াড়া সমাজ' কবিতায় কবি সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবৈষম্যের বিষবাষ্পের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন এবং এই সমাজটাকে বেয়াড়া ঘোড়ার মতো একগুঁয়ে বলে ব্যঙ্গ করেছেন। আর এই কাব্যগ্রন্থের শেষতম কবিতা 'শম্বুকধর্মী চিরকাল'। এতে কবি তাঁর শামুকের মতো খোলস আঁকড়ে থেকে যাওয়া প্রেমিকা হৃদয়ের অদ্বিতীয় আকুতিকে চিহ্নিত করেছেন। পুরুষ যেখানে বারবার শরীরী প্রেমের সন্ধানে গভীর জলের মাছ হয়ে ওঠে; সেখানে নারী চিরকালই প্রেমের জোয়ারে আঁকড়ে থাকে শামুকের মতো একমাত্র খোলসের আশ্রয়। সেটিই কবির কলমে উঠে এসেছে এভাবে–

"আমি যে শম্বুকধর্মী
চিরকাল, আঁকড়ে থেকে
ফিরে যাই আপন
খোলসে
যখন জোয়ার আসে।"[১৩]

- এইভাবে এই কবিতাটিতে তাঁর নারী হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেমভাবনা ব্যক্ত।

কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'চণ্ডালিনী ভণে' (২০১৫) ৫০ টি কবিতার সংকলন। এই কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে কবির প্রেম ও প্রতিরোধ ভাবনা। কবির কাব্যবৃত্তের সবচেয়ে সাম্প্রতিকতম সংযোজন হল 'বনচণ্ডালীর গাথা' কাব্যগ্রন্থটি। এটি তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয় বইটি। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল ২০১৪ থেকে ২০২২ পর্যন্ত। ২০২০-২১ এর অতিমারী, পরিযায়ী শ্রমিকদের যন্ত্রণা, সীমান্ত পেরোনো মানুষ, শাহিনবাগ আন্দোলন, মতুয়া আন্দোলন, নাগরিকত্ব হরণের প্রক্রিয়া, কৃষিবিল আন্দোলন- এসবের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতায়। এই প্রসঙ্গে কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল তাঁর 'বনচণ্ডালীর গাথা' (২০২৩) কাব্যের ভূমিকাতেই বলেছেন–

"একজন কবির তো প্রতিবাদ করার এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর কিছু নেই। তাই বার বার কলম ধরি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে।"[১৪]

– এই কাব্যগ্রন্থটি তাঁর প্রতিরোধ ভাবনার এক জ্বলন্ত শিখা। তাই সাম্প্রতিককালের ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন এ কাব্যের ১১ সংখ্যক কবিতায়–

"ধ্বজা নিয়ে ছুটিতেছে
উন্মত্ত শিকারী সব ধর্মের নামে"[১৫]

- দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে কঠিন সীমান্ত নীতির ঘেরাটোপে, সীমান্ত পেরোনো মানুষের মৃত্যু যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে; তখন একমাত্র সত্যি হয়ে ধরা দেয় নারীর চোখের জল। দেশভাগ ও কাঁটাতারের বেড়াজাল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর জীবনকেই বেশি অশ্রুসিক্ত করেছে- সেকথা সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত সমান সত্যি। একথাই কবি বলতে চেয়েছেন তাঁর 'বনচণ্ডালীর গাথা' কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতায়–

"স্বামীতো প্রহরী নয়
সীমান্ত পেরনো অধিবাসী
লাশ হয়ে ফিরে আসে
ভূমিপুত্র ভূমিহীন দেশে"[১৬]

২০১৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সমপ্রেম বিষয়ে আইনি স্বীকৃতি দেয়। ভারতের বুকে যা ছিল একটি ঐতিহাসিক রায়। এই স্বীকৃতি ছিল সমপ্রেমী মানুষদের দীর্ঘদিনের লড়াই ও প্রতিবাদের ফল। সেই দিকটি উঠে এসেছে কবি কল্যাণী ঠাকুরের 'বনচণ্ডালীর গাথা' কাব্যের ২৪ সংখ্যক কবিতায়-

"'নগর কীর্তনীয়া'রা ঐ চলেছে মিছিলে
তুমি দিও প্রেম বারি এই
খরা দুর্দিনের কালে"[১৭]

- আবার দেশজুড়ে চলা শাসকের অত্যাচার ও অরাজকতার বিরুদ্ধে কখনো কখনো বারুদের মতো গর্জে উঠেছে কবির কলম। তাঁর চোখেও দেশ ও মৃত্যু উপত্যকা একাকার হয়ে গেছে কবি নবারুণ ভট্টাচার্যের 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' কবিতার মতো। তিনিও প্রতিবাদ জানিয়েছেন নিজের ভাষায়। এই কাব্যের ২৬ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখেছেন-

"হায় মানুষ!
বলো এই মৃত্যু উপত্যকাই আমার
পৃথিবী, আমার দেশ, আমার শহর, আমার গ্রাম"[১৮]

- হিন্দুত্বের উগ্রতা নিয়ে চলা শাসকের স্বৈরাচারের বিরোধিতা করতেও কুণ্ঠিত নন কবি। এই কাব্যের ৩০ সংখ্যক কবিতায় তার প্রতিফলন-

"চমৎকার অঙ্ক হিন্দু ভারতবর্ষের-"[১৯]

- রক্তচক্ষু করা শাসকের মতুয়া-সহ অনেকের নাগরিকত্ব হরণের প্রস্তাবের ছবিটিও উঠে এসেছে কাব্যটির ৩৩ সংখ্যক কবিতায়–

"মাটির পরে হারাস মাটি এতো
তাতেও শিক্ষা নাই
কাগজ দিয়ে আবার কি তুই চাস
ক্যাম্পে সবাই যাই"[২০]

- কবির প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের আগুন ঝলসে উঠেছে এভাবেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গলা উঁচানোর বিষয়ে তিনি অকপট। এ সম্পর্কে কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল তাঁর একমাত্র ছোটগল্প-অণুগল্পের সংকলন গ্রন্থ 'ফিরে এল উলঙ্গ হয়ে' (২০১৪) -এর ভূমিকাতে বলেছেন– "কলমে সংযত হতে পারি না। লিখে ফেলি। কেউ ব্যথা পাক তা ভেবে লিখিনা।"[২১]– এই নির্দ্বান্দ্বিক বিবেকই তো একজন শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির নির্ভেজাল উপাদান। কল্যাণী ঠাকুর প্রতিরোধের কাজটা করে গেছেন এভাবেই।

অতিমারী ও বিপর্যস্ত জনজীবনের দিনগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের অসহায়তা ও বেদনাময় জীবনালেখ্য কবি তুলে এনেছেন তার 'বনচণ্ডালীর গাথা' কাব্যগ্রন্থের ৩০, ৩৫, ৫০ সংখ্যক সহ নানা কবিতায়। আসলে রাষ্ট্রের আগাম পরিকল্পনাহীন কিছু হঠকারী নীতি-উদ্যোগই সেই দিনগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকের জীবনকে অশ্রুসিক্ত করে তুলেছিল। সেই আখ্যানটুকু বলতে ভোলেন না কল্যাণী (৩১ সংখ্যক কবিতা)–

"এইভাবে পাখি ও কালো মানুষের
অঙ্ক মিলে যায়
তখনই বিশেষণ আসে
পরিযায়ী নামে"[২২]

- এই কাব্যগ্রন্থের ৩৪ সংখ্যক কবিতায় উঠে এসেছে অতিমারীর ভয়াবহ দিনগুলিতে জীবন-জীবিকা হারা ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর জীবনের যন্ত্রণার ছবি। যেখানে মানুষগুলো বহুদিন ধরে অসহায় নিরন্ন জীবন যাপন করে। উতলানো ভাতের গন্ধ তাদের কাছে তো পরম উপভোগ্য হয়ে উঠবেই। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'ভাত' গল্পেও এরকম ভাতের আকাঙ্ক্ষার ছবি এঁকেছিলেন উচ্ছব চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। এই কবিতাটিতেও কল্যাণী ঠাকুর সে কথাই বলতে চেয়েছেন। এই ভাত আর সহজে জোটে কই–

"উপোসী মানুষ ওই গ্রাম শহর ভরা
কতকাল কাজ নেই একগণ্ডা ক্ষুধার্ত পেট"[২৩]

- আবার কৃষকস্বার্থ বিরোধী কৃষিবিলের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা কবির কলম এইভাবে কথা কয় (৩৬ সংখ্যক কবিতা)-

"ফেরাতে হবে তোমার কর্পোরেট
বিল, দেখা যাক রাজা আর
কৃষক প্রজার বিদ্রোহ"[২৪]

- শাসকের চোখে চোখ রেখে কথা বলার মতো সাহস ও স্পর্ধা যে কবির আছে; এইসব কবিতাগুলি তার প্রমাণ দেয়। শাসকের স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষক প্রজার ন্যূনতম অধিকারের পক্ষে তিনি কথা বলতে পারেন। কৃষকের চোখের জল চিনতে কবির অসুবিধা হয় না (৪৮ সংখ্যক কবিতা)–

"কৃষকের চোখে জল এই ভাদরে"[২৫]

- আর করোনা মহামারীর দিনে শাসক ও সভ্যতার মানবিক বিপর্যয়ের চিত্রটিকেও দেখাতে ভোলেননি কবি। যেখানে গঙ্গা হয়ে উঠেছিল অতিমারীতে মৃত হাজার হাজার শবদেহের আধার। দেশের এক একটি নাগরিকের প্রতিও তখন শাসকের এত ঘৃণা! তখন তো তারা আর দেশের নাগরিক নয়, অচ্ছুৎ লাশ কেবল। এই কাব্যের ৪০ সংখ্যক কবিতায় উঠে এসেছে সেই দিকটি–

"মানব সন্তান সব ভেসে যায়
শতদ্রু ইরাবতী চন্দ্রভাগা নয়
গঙ্গায় লাশ ভেসে যায়"[২৬]

- ঐতিহ্যবাহী এই গঙ্গাই আজ মরদেহ বয়ে আনে মানবতার বিপর্যয়ে।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও ভারতের বুকে থেকে যাওয়া বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে গলা চড়ান কবি। শাসকের উগ্র হিন্দুত্ববাদেরই চরম পরিণতি সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া একাধিক দলিত নিষ্পেষণের মতো ঘটনা। ৪৭ সংখ্যক কবিতায় তিনি লেখেন-

"পচাত্তুরে আজাদির দেশে
ন' বছরে জেনে গেল
বর্ণবাদী চরম পরিণতি
পত্ পত্ উড়ছে ঐ
রক্তাক্ত তেরঙ্গা"[২৭]

- আবার ৭৫ বছরের স্বাধীনতা মহোৎসবের মিথ্যা আত্মম্ভরিতাকেও ব্যঙ্গ করেন কবি। ভারতের প্রথম আদিবাসী নারী হিসেবে মাননীয়া দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হলেও; শাসকের ময়দানে, সমাজের ক্ষেত্রভূমিতে দ্রৌপদী এবং দ্রৌপদীরা যে জাতপাতের রাজনীতির দাঁড়িপাল্লায় অচ্ছুৎ-ই থেকে গেছেন- সেকথা কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল তুলে ধরেন এই 'বনচণ্ডালীর গাথা' কাব্যগ্রন্থের ৪৬ সংখ্যক কবিতায়। আসলে সমাজের বৃত্তে

দ্রৌপদীরা অচ্ছুৎই থেকে যায়। শুধু রাজনীতির প্রয়োজনে কদাচিৎ ফায়দা তোলার চেষ্টা করা হয় দ্রৌপদীদের দিয়ে। এক দলিত বা আদিবাসী নারী রাষ্ট্রপতি হলেও দলিতদের জন্য শাসকের শাসননীতির কোনো আর্থসামাজিক পুনর্বিন্যাস হয়না, যা দিয়ে সব দ্রৌপদীরা আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকারের সিংহাসনে বসতে পারে-

"হায় অমৃত আজাদি
ডুবে আছো মৃত মহোৎসবে
উপহার দিয়েছ বটে রাষ্ট্রপতি এক
তবুও অচ্ছুত্ থাকে
মটকির জল"[২৮]

- তাই শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ এবং সামাজিক প্রয়োগ এই দুটো বিষয় যে সমরেখায় মেলে না, ভুল হয়ে যায় তার হিসাব বিন্দুতে- সে কথাই কল্যাণী বলতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়। এইভাবে নানা দিক দিয়ে সমাজের সামগ্রিক নারীসমাজ, শোষিত শ্রেণি ও দলিত নারীর সংকুচিত অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন কবি। আর সেই মতো সামাজিক সাম্যচিন্তা ও প্রতিরোধের বিবেকী স্বর নির্মাণ করেছেন তিনি।

সবশেষে বলা যায়, জীবন থেকে দেখা ও পাওয়া অভিজ্ঞতাই দলিত কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের কাব্য দুনিয়া তথা সমগ্র সাহিত্য দুনিয়ার মূল রসদ হয়ে উঠেছে। দলিত নারী হিসেবে তিনি বারবার দেখেছেন সমাজে নারীর কোণঠাসা জীবনের অসহায়তা ও আত্মধিক্কার। সেইজন্য তারই বিরুদ্ধে নারী যাতে স্বাধীন কণ্ঠে বলশালী হয়ে উঠতে পারে সেই উচ্চারণ ও স্বরটুকুই কবি সৃষ্টি করেছেন তাঁর কবিতায়। তাই তো তিনি পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বারবার সুর চড়ান, নারীপুরুষের সাম্যচিন্তাকে তাই বারবার দাঁড় করান তাঁর কাব্য ফসলে। এইভাবে তাঁর কবিতায় সমাজে নারীর একাধিক বিষণ্ণতার চিত্র রূপ পায় এবং তার বিরুদ্ধে শোনা যায় একটা তীব্র প্রতিবাদী স্বর। সেখানে জীবন থাকে, প্রেম থাকে। সেইসঙ্গে থাকে প্রেমের বিষন্নতা, পুরুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত নারীর প্রেমের যন্ত্রণা ও বঞ্চনা, পুরুতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীর আত্ম-উচ্চারণ সবকিছুই। সবটুকু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তাঁর এই বলিষ্ঠ ঘোষণায়। কখনো তাঁর কাব্যে এসবের অনুঘটক হয়ে কাজ করে একাধিক পৌরাণিক ঐতিহ্যের উপকরণ। সেই পুরাণ প্রসঙ্গ ও পৌরাণিক উপকরণের নবমূল্যায়ণ ঘটিয়ে তিনি এক পৌরাণিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার স্থাপন করেন আধুনিক দেশকাল-সম্পৃক্ত সমকালীন জীবন ভাবনায়। এইজন্যই তাঁর কবিতা এত বেশি জনপ্রিয়। দলিত নারীবাদী কবি কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের এই জনপ্রিয়তাই তাঁর সমস্ত সৃষ্টি নিয়ে তাঁকে 'কল্যাণী রচনা সমগ্র' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থ প্রকাশের তাগিদ অনুভব করায়। দিন দিন দলিত সাহিত্যের পরিধি ও পাঠক উভয়ই বাড়ছে সমান্তরালে। 'কল্যাণী রচনা সমগ্র' (প্রথম খণ্ড)-এর ভূমিকাতে উঠে এসেছে লেখকের সেই বক্তব্যটি–

> "'কল্যাণী রচনা সমগ্র' প্রথম খণ্ড পাঠকের হাতে পৌঁছে দিয়ে অনেকটা ভারমুক্ত মনে হচ্ছে। কারণ এই বইগুলো যখন প্রকাশিত হয় তখনও সেভাবে দলিত সাহিত্যের পাঠকশ্রেণি তৈরি হয়ে ওঠেনি। এখন অনেক আগ্রহী লেখক ও পাঠকের সংখ্যা বর্ধিত হয়েছে"[২৯]

- বর্তমানে ভারতীয় 'দলিত সাহিত্য' (Dalit Literature)- এর চর্চা ও প্রবণতা সাহিত্য পরিধিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের পক্ষে এক ইতিবাচক ইশারা। দলিত সমাজের জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুকে এখান থেকেই হয়তো একদিন জ্বলে উঠবে দীপাবলির রঙ মশাল। এখান থেকেই হয়তো সমাজের 'অর্ধেক আকাশ'রা একদিন অন্ধকারের বুক চিরে দেখবে সাত রঙের রামধনু। আমাদের সবার দৃষ্টি ও অপেক্ষা থাকুক সেই স্বপ্ন-সাধিত দিনটির প্রতি।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী। চণ্ডালিনীর কবিতা, ১১ সংখ্যক। কল্যাণী রচনা সমগ্র (প্রথম খণ্ড): ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী, কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, ১৬ আগস্ট ২০২১, পৃ. ১৪৫।
২। তদেব, চণ্ডালিনীর কবিতা। ১ সংখ্যক', পৃ. ১৩৫।
৩। তদেব, চণ্ডালিনীর কবিতা। ৫২ সংখ্যক', পৃ. ১৮৮।
৪। তদেব, তোমার দিকে (যে মেয়ে আঁধার গোণে)। পৃ. ১০৬।
৫। তদেব, অণুকবিতা। পৃ. ৮৫।
৬। তদেব, জীবনের কথা বলি। পৃ. ৮৪।
৭। তদেব, এসো সন্ধির কথা বলি। পৃ. ৮৭।
৮। তদেব, তত ভালো নই। পৃ. ৭৫।
৯। তদেব, ভিতর পানে। পৃ. ১৩২।
১০। তদেব, অশ্বমেধের ঘোড়া (ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত)। পৃ. ৩৮।
১১। তদেব, পৃ. ৩৮।
১২। তদেব, পৃ. ৩৮।
১৩। তদেব, শম্বুকধর্মী চিরকাল। পৃ. ৭২।
১৪। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী। ভূমিকা। বনচণ্ডালিনীর গাথা: ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী, কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০২৩, পৃ. ৭।
১৫। তদেব, ১১ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ১৯।
১৬। তদেব, ১৭ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ২৫।
১৭। তদেব, ২৪ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ৩২।
১৮। তদেব, ২৬ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ৩৪।
১৯। তদেব, ৩০ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ৪১।
২০। তদেব, ৩৩ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ৪৬।
২১। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী। ভূমিকা। ফিরে এল উলঙ্গ হয়ে: ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী, কলকাতা: প্রত্যুষ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৪২১
২২। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী। ৩১ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী, কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০২৩, পৃ. ৪২।
২৩। তদেব, ৩৪ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ৪৭।
২৪। তদেব, ৩৬ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ৪৯।
২৫। তদেব, ৪৮ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ৬২।
২৬। তদেব, ৪০ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ৫৪।
২৭। তদেব, ৪৭ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ৬১।
২৮। তদেব, ৪৬ সংখ্যক কবিতা। বনচণ্ডালীর গাথা, পৃ. ৬০।
২৯। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী। ভূমিকা। কল্যাণী রচনা সমগ্র (প্রথম খণ্ড): ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী, কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, ১৬ আগস্ট ২০২১, পৃ. ৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী। আমি কেন চাঁড়াল লিখি। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, ১৬ আগস্ট ২০১৬।

২। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী। আন্ধার বিল ও কিছু মানুষ। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ, ১৭ আগস্ট ২০১৯।

৩। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী। মতুয়া ধর্ম প্রসঙ্গে। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ ২০১০।

৪। রায়, দেবেশ (সম্পা.)। দলিত। নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৫।

৫। ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.)। নিম্নবর্গের ইতিহাস। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, এপ্রিল ১৯৯৮।

৬। লিম্বালে, শরণকুমার। দলিত নন্দনতত্ত্ব (অনুবাদ– প্রামাণিক, মৃন্ময়)। কলকাতা: তৃতীয় পরিসর, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৭।

৭। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী। চণ্ডালিনী ভণে। কলকাতা: প্রত্যুষ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫।

৮। ব্যানার্জী, সিদ্ধেশ্বর ও ব্যানার্জী, অরীন্দ্রজিৎ (সম্পা.)। বাংলা ছোটগল্পে নিম্নবিত্তের পরিসর। কলকাতা: সোপান, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০২০।

৯। মণ্ডল, মননকুমার (সম্পা.)। পার্টিশন সাহিত্য: দেশ-কাল-স্মৃতি। কলকাতা: গাঙচিল, দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৯।

১০। সরকার, জয়শ্রী। প্রান্তবাসী হরিজনদের কথা। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১২।

১১। ভট্টাচার্য, তপোধীর। নারী চেতনা: মননে ও সাহিত্যে। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৭।

১২। রায়, অলোক (সম্পা.)। সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য। কলকাতা: সাহিত্যলোক, সংশোধিত মুদ্রণ, মার্চ ২০১৫।

১৩। গুহ, মুকুল (সম্পা.)। মুক্ত বাতায়ন সিরিজ ১: ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য। কলকাতা: টু ওয়ার্ডস্ ফ্রিডম্, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫।

সহায়ক পত্রপত্রিকা:

১। ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ। 'দলিত শব্দটি প্রতিবাদের প্রতীক', কলকাতা: আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

২। প্রামাণিক, মৃন্ময়, 'বাংলায় দলিত সাহিত্য ও দলিত চর্চা', কোরক, মে ২০১৩

৩। ঠাকুর চাঁড়াল, কল্যাণী (সম্পা.), 'বিংশতিতম সংখ্যা: দলিত নারীর বিবিধ রচনা', নীড় পত্রিকা, পঞ্চবিংশতি বর্ষ, ১৭ আগস্ট ২০১৯